আবহমান

মো. আরিফুল হাসান

বাঁধাই পর্ব

যেজন তোমার মনের কোনে বাঁধিয়াছে ঘর
বন্ধু, লইও তুমি, লইওরে, লইও তার খবর

ছবিটাকে ফ্রেম থেকে খুলে রাখে রামেশ, তার আর ছবিটি দেখতে ইচ্ছে হয় না। কেমন যেনো বিস্বাদ হয়ে গেছে ছবিটি। গতকাল পর্যন্ত সে ছবিটি দেখেই কাটিয়েছে। তার শয□যার পাশে, খাবার টেবিলে, এমনকি বসার ঘরেও সে ছবিটিকে সাথে বহন করতো। এখন সবকিছু নিরামিশ ঠেকছে তার কাছে। মনে হচ্ছে ছবিটি থেকে সমস্ত রং উঠে গেছে। পিয়ালির মুখটাও কেমন লেপটে গেছে কালো কালসিটে আঁধারের কালিতে। সে মুখের দিকে চেয়ে এখন শুধু রাশি রাশি ঘৃণা উথলে উঠছে র□মেশের মনে। ছবিটাকে সে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ছুড়ে ফেলে ময়লার ঝুড়িতে। তার পর আবার সেগুলো কুড়িয়ে জোড়া লাগায়। অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছবিটির দিকে। তারপর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সে ভাবতে পারে না, পিয়ালি এ কাজটি কিভাবে করতে পারলো। সামান্য একটু সংসার, আর তার একটুকরো খুঁনসুটি, বা ঝগড়াই বলা চলে। তার জন্য সে বাসা ছেড়ে গিয়েছে আজ তিনমাস। রামেশ অনেক যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছে। পিয়ালি সাড়া দেয়নি। রামেশ দুই দুইবার শ্বশুর বাড়িতেও গিয়েছে। সবার আচরণ নম্র থাকলেও পিয়ালির ছিলো ঔদ্ধত্য। সে রামেশের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। হ্যাঁ, রামেশ তাকে চড় মেরেছিলো ঠিকই। কিন্তু এর জন্যে সে ক্ষমাও পেতে পারতো। তিনবছরের সংসারে এর চে বেশি কি ভালোবাসেনি রামেশ? ভালোবাসার পরিমাণটিই বড়, কিন্তু মানুষ ভালোবাসা মনে রাখে না, তারা ঘৃণাটা মনে রাখে। রামেশ বুঝতে পারে না, পিয়ালির এমন সিদ্ধান্ত সত্যিই কি অমূলক নয়? পিয়ালি তাকে চিঠি পাঠিয়েছে, ডিভোর্স লেটার। হাতে পেয়ে কাল সন্ধ্যা থেকে এখন বেলা বারোটা অবধি। ঘুম-নিদ্রা-পানাহার সব ভুলে গেছে রামেশ। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না, পিয়ালি এ কাজটি করেছে। ডিভোর্স লেটারটি হাতে পেয়ে সে অনেকবার ফোন করেছে পিয়ালিকে। পিয়ালি ফোন ধরেন□। শ্বশুর শ্বাশুরিকেও ফোন করেছে একটু পরপর, কেউ তুলছে না ফোন। নিজে গিয়ে যে একবার খোঁজ খবর নিয়ে আসবে সে ভরসাটুকুও এখন সে পাচ্ছে না। যদি আবার তাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনসুদ্ধ অপমান করে? রামেশ বুঝতে পারে না সে কি করবে। কোনো উপায়ন্তর পায় না। সে উঠে গিয়ে ফ্রিজের ঢাকন□টি খোলে। পেটের ভেতর যেনো দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। একটুকরো রুটি নেবে ভেবে সে আবার ফ্রিজটি বন্ধ করে রাখে। বাথরুমে যায় রামেশ ঝরণা ছেড়ে দিয়ে ভিজতে থাকে কৃত্রিম বৃষ্টির অঝর ধারায়। যেনো তার ভেতর থেকে ধুয়ে যাবে অজস্র লহমায় শতশত ক্ষতের যন্ত্রণা, পিয়ালির দেয়া বিষতীরের ভয়াবহ আঘাত।

রান্নাঘর থেকে বের হয়ে রামেশ তার খাবারগুলো গরম করে। পেট পুরে খায়। নিজেকে বোঝায়, পিয়ালি যদি পারে তবে যে তাকেও পারতে হবে। সে যদি তাকে ছাড়া সুখি হতে পারে তাহলে সেও পারবে পিয়ালিকে ছাড়া সুখি হতে। জীবনে বাঁচতে গেলে ভাঙা-গড়া আছেই। চর পড়ে বলেই নদীর গতি অব্যাহত থাকে। মানুষের জনপদে ওঠে নতুন নতুন সূর্য, ঢেউ খেলে নতুন ছন্দের স্বপ্নগন্ধা আকাশ। তবুও মানুষ স্বপ্ন ভঙ্গের আঘাতে কাবু হয়। কিছুটা গতি মন্থর হয়ে যায় তার। রামেশও বেশ কয়েকদিন অফিসে যেতে পারেনি। তারপর সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। রামেশের অফিসের কলিগদের মধ্যে কথাটি দুচারদিন কানাঘুষা হলেও এখন থেমে গেছে। একসময় সবই থেমে যায়, কি খ্যাতি, কি সুখ্যাতি, সবই কালের গর্ভে বিলিন হয়। একরাশ অন্ধকারের চাদর সবকিছু লেপ্টে দিয়ে আবার অন্ধকারের ভেতর থেকে উগরে দেয় টগবগে সূর্যরঙের ভোর। রামেশ জানে, পিয়ালি আর তার জীবনে আসবে না, তবুও নতুন কোনো সম্পর্কে জড়াতে চায় না সে। বন্ধুমহল থেকে দু-একজন পরামর্শ দিচ্ছে আবার বিয়ে করে ফেলতে। রামেশ হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। সেদিন প্রিন্সিপাল স্যার প্রায় আটকে ফেলেছিলো তাকে। নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে অনুরোধ করে বলেছে দেবী শ্বেতাকে বিয়ে করতে। শ্বেতা বয়েসে র□মেশের ছোটই হবে। বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যে স্বামী মারা গেছে। দেখতে শুনতে খারাপ না। তারওপর তারা দুজন একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। রামেশ বাংলার প্রভাষক, দেবী শ্বেতা ফিজিক্সের। দুজনেই অফিসে চোখাচোখি হয়। দুজনেই লজ্জা পেয়ে চোখ লুকায়। প্রিন্সিপালের টেবিল থেকে কথাটি ছড়িয়ে যায়। একদুজন কলিগও বিষয়টিতে অনুরোধ করে। রামেশ, মত দেয় না। দেবী শ্বেতার এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। রামেশ মনে করে, হয়তো দেবী শ্বেতাই কোনোভাবে প্রিন্সিপালকে দিয়ে তাকে প্রস্তাব করিয়েছে। এ বিষয়টি সে আরও নিশ্চিত হয় আজ যখন শ্বেতা তাকে কলেজের গেটে শুভসকাল জানিয়ে বলেছে বিকেলের দিকে একটু কথা আছে, সে তাকে ফোন করবে। রামেশ হ্যাঁ, না বলেনি। একটু হেসেছে। কেনো হেসেছে সে তা ভাবতে পারে না। বাসায় আসার পর থেকে মনে হচ্ছে, দেবী শ্বেতা এই বুঝি তাকে ফোন করলো। কিছুটা উত্তেজিতও বোধ করলো মনে মনে। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে খেলো। তারপর একটি বই হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলো পশ্চিমের আকাশকে মুখোমুখি রেখে।

সেদিন আর শ্বেতা তাকে ফোন দেয়নি। পরদিন সাপ্তাহিক ছুটি। দেবী শ্বেতা ফোন করলো রামেশকে। ডাকলো কিংস চায়না রেস্টুরেন্টে। দুজনে দুটো আইসক্রিম নিয়ে মুখোমুখি বসলো, দেবী শ্বেতার চেহারাটা যেনো ক□মন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রামেশ একবার চোখ তুলে তাকালো দেবী শ্বেতার দিকে। তার ভেতরটা কেনো যেনো অজান্তেই কেঁদে উঠলো একবার। দেবী শ্বেতার পাণ্ডর মুখে জমানো বরফের দুঃখ যেনো থই থই করছে নদীর মতো। রামেশ চোখ ফিরিয়ে নিলো। পরক্ষণেই আবার তাকালো দেবী শ্বেতার মুখে। কিছু বলতে যাবে এমন সময় ঠোঁট নড়ে উঠলো দেবী শ্বেতার। “আমি আসলে চাই না এ বিয়ে হোক।” রামেশ যেনো নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারে না। সে ভেবেছিলো আজ বুঝি দেবী শ্বেতা নিজেই অনুরোধ করবে তাকে বিয়ের ব্যাপারে। অথবা মিষ্টি একটি আড্ডা দিবে অযথাই রোমান্টিসিজমের চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু না, এমন কথা বলতে পারলো দেবী তা যেনো রামেশের বিশ্বাসেরও বাইরে। বিস্ময়ে রামেশ কিছু বলতে পারলো না। শ্বেতাই আবার মুখ খুললো, আসলে আমার স্বামী মারা যায়নি। তাকে খুন করা হয়েছে। সবাই ভাবছে এক্সিডেন্ট। কিন্তু

সেটি ঘটানো হয়েছিলো। তার পানীয়তে প্রচুর পরিমাণে মেশান□ হয়েছিলো ঘুমের ওষুধ। যাতে, তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ড্রাইভ করতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে দূর্ঘটনা কবলিত হয়। সবকিছু করা হয়েছিলো সু পরিকল্পনায়। অত্যন্ত নিখুঁত ছিলো সে নীল নকশা। আর নকশাকার সফলও হয়েছে।" রামেশ দেখতে পায় দেবী শ্বেতার মুখে-চোখে কেমন একটি উত্তাপ যেনো দাউ দাউ করছ□। একটু আগের ফ্যাকাসে ভাবটি একেবারেই নেই। "আর হ্যাঁ, সেই নকশাকার কে জানতে চান?" দেবী শ্বেতা যেনো রামেশ তার কথার অনুরণন থেকে হারিয়ে না যায় এমন ভাবে পূর্বের কথাটার সাথে টেনে বলেন, "জানতে চান? সে হচ্ছি আমি।" বিস্ময়ের আতিশয্যে রামেশ যেনো কিংস চায়নার চেয়ারটেবিল বনে গেছে। দেবী শ্বেতা উঠে যাবার পরও অনেক্ষণ সে বসে ছিলো রেস্টুরেন্টের লাল-নীল আলোতে।

বাসায় এসে রামেশ আবার ভাবতে লাগলো দেবী শ্বেতার কথাগুলো। যে যে কারণগুলো সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে একবার নয়, বারবার মারলেও সামান্য অন্যায় হতো না। শ্বেতাকে দিনরাত অত্যাচার, এমনকি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও একদিন শ্বেতার উপর চড়াও। শ্বেতা সেদিন কোনোরকম পালিয়ে এসেছে বাবার বাড়ি। তারপর একসপ্তাহ পরে নিজেই গিয়েছে আবার। আর গিয়েই এ সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। রামেশ বুঝতে পারে না, দেবী শ্বেতা যদি তাকে বিয়েই না করবে তাহলে এসব কথা তার কাছে বলতে গেলো কেনো। কেউ কি নিজের খুনের কথা অন্যকাউকে বলে? কাকে বলে? এতটা বিশ্বাস কেনো করতে যাবে দেবী শ্বেতা তাকে। সে বিশ্বাস করতে পারে না, আসলে কি দেবী শ্বেতা তাকে সত্য কথা বলেছে? নাকি মিথ্যে মিথ্যে গল্প বলেছে রামেশের সাথে। কিন্তু তার বলার ধরণ দেখে তা মিথ্যে বলেও ভাবা যায় না। রামেশ তবুও অবিশ্বাস করে চলে, নিজের অজান্তেই বলে, ''না দেবী শ্বেতা সবকিছু মিথ্যে বলেছে।" কিন্তু পরক্ষণেই দেবী শ্বেতার কঠিন চেহারাটা তার মনে ভাসে। না সে নিশ্চিত, দেবী শ্বেতা সত্য কথাই বলেছে। সে এ কলেজে চাকুরি করছে আজ ছ' মাস। স্বামী ম□রা যাবার পরপরই তার নিয়োগ হয়েছিলো। রামেশের নিয়োগ হয়েছে তার আগের ব্যাচে। সে হিসেবে রামেশ শ্বেতার সিনিয়র। এ পর্যন্ত শ্বেতার আচরণে কখনোই মনে হয় না সে বানিয়ে বানিয়ে এ গল্প বলবে।

পরদিন কলেজে গিয়ে রামেশ শ্বেতাকে খুঁজে পায় না। শ্বেতা একসপ্তাহের ছুটি নিয়ে গ্রামে গেছে বাবা মায়ের কাছে। ছুটি সে নিয়ে রেখেছিলো গতসপ্তাহেই। রামেশ জানতে পারেনি। এমনকি সেদিন কিংস চায়নাতে বসেও শ্বেতা বলেনি রামেশকে ছুটির কথা। রামেশের একবার ইচ্ছে হলো শ্বেতাকে ফোন করে। কিন্তু কিসের যেনো একটা জড়তা ঘিরে ধরে তাকে। তার আর বেশি ভালো লাগে না। প্রিন্সিপাল স্যারকে বলে সেদিন বাড়িতে চলে আসে। একটি শঙ্খ ঘোষের কবিতার বই হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। একটি দুটি প্রেমের কবিতা পড়ে। ভালো লাগে না তার। উঠে গিয়ে একমগ কফি বানিয়ে আনে। তার মনে হয় কোথাও থেকে ঘুরে আসলে মনটা হয়তো হালকা হবে। নিচে নেমে সে সোনার গাঁ'য়ের উদ্দ□শ্যে বের হয়। পানাম নগরীর প্রতিটি ইটের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা দুঃখগুলোকে পড়ার চেষ্টা করে। মনটা স্থির করতে পারে না রামেশ। পকেট থেকে মুঠোফোনটি বের করে ডায়াল করে দেবী শ্বেতার নাম্বার। সুইচ অফ দেখাচ্ছে। আবারও চেষ্টা করে রামেশ, আবারও সুইচ অফ। মাথার উপর দিয়ে দুয়েকটি কাক কা কা করে ডেকে উড়ে যায়, যেনো পানাম নগরী

দুপুরের নির্জনতা আরও বেশি গাঢ়তর হয়। একটি হেলে পড়া গাছের ছায়ায় ঠেস দিয়ে বসে রামেশ। হঠাৎ তার মনে হয় সোনার গাঁ মিউজিয়ামের ভেতরে একটি লাইব্রেরি আছে। সেখান থেকে একটু ঘুরে আসলে কেমন হয়? সে উঠে পরে। পানাম নগরীর ধ্বংসের দ্বার দিয়ে সে আবার কোলাহলে প্রবেশ করে। টিকেট কেটে মিউজিয়ামে প্রবেশ করে সে। সোজা জমিদার বাড়ির পূর্বপাশের প্রশস্ত রাস্তা ধরে হেটে যায় লাইব্রেরিটির দিকে। লাইব্রেরির দরজায় পা দিয়েই সে হোঁচট খায়। ভেতরে বসে আছে পিয়ালি। সাথে একজন যুবক
ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।

পালা পর্ব
মন যদি রাখবারে বন্ধু মনে ক্যান দাও আড়ি
তুমি তো জানোনা তোমার হৃদয়ে কার বাড়ি

পাঠাগারের ভেতরে আর ঢোকেনি রামেশ। তার বাসা থেকে সোনার গাঁয়ের দূরত্ব তেমন নয়। আধঘন্টা কি পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ। সেদিন সে সেখান থেকে সোজা বাসায় চলে আসে। পিয়ালিকে দেখার পর থেকে একটি অন্য আগুন তার ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সেই পিয়ালি, ভার্সিটি জীবনের প্রেমের সঙ্গী পিয়ালি, ভালোবেসে যাকে বিয়ে করেছিলো রামেশ। তারপর তিনবছর সংসারও করেছে দুজন। তারপর পিয়ালিই তাকে ছেড়ে গেছে। তাও আজ বছর খানেকের ডাক পড়লো। এতদিন, এই একটি বছর পিয়ালির সাথে রামেশের আর কোনো দেখা হয়নি। আজ একবছর পর পিয়ালিকে যেনো আরও বেশি সুন্দর লাগছিলো। যেনো ঠিকরে পড়ছিলো তার রূপ। একপলক দেখেই রামেশের চোখ ঝলসে গিয়েছিলো যেনো। সাথের যুবকটিও দেখার মতো। পোশাক-পরিচ্ছদে ধারণা করা যায় বিশাল ধনকুবের পরিবারের সন্তান। পিয়ালি তাহলে সুখেই আছে! একটি দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ঝরে পড়ে রামেশের ভেতর থেকে। কিন্তু পিয়ালি থাকে কোথায়? সে হঠাৎ করে মরিয়া হয়ে উঠে পিয়ালির সন্ধান নিতে। পরদিন সে আবার কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে সোনারগাঁ লাইব্রেরিতে যায়। দায়িত্বরতা এক সুদর্শনা তরুণীকে প্রশ্ন করে পিয়ালির বিষয়ে। সে এ বিষয়ে তেমন কিছু বলতে পারে না। জানায়, মাঝে মধ্যেই তারা আসে। যখনই আসে দুজন একত্রে আসে। ইতিহাস ও সাহিত্যের বইপত্র পড়াশুনা করে। ঘন্টা দুয়েক থেকে আবার চলে যায়। প্রায়ই আসে এ কথাটি রামেশের মনে আশার সঞ্চার করে। পরদিন আবার সে কলেজ শেষ করে সোনারগাঁ মিউজিয়ামে আসে। কিন্তু দেখা মেলে না পিয়ালির। তিনটা থেকে বসে থেকে সন্ধ্যা সাতটার সময় বের হয়ে যায় রামেশ। গিয়ে বসে পানাম নগরীর একটি ভাঙা দালানের জানালায়। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে বাসায় চলে আসে। বাসায় এসে তার মনটি আরও বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এভাবে সপ্তাহের তৃতীয় চতুর্থ দিনটিতেও সে সোনারগাঁ যায়। কিন্তু বিধি বাম। পিয়ালির সাথে তার দেখা হয় না। রামেশ ভাবে, হয়তো পিয়ালি সকালের দিকে আসে। তাই সপ্তাহের পঞ্চম দিনটির জন্য সে ছুটি নেয় ফোন করে। বুধবার সকাল দশটার মধ্যেই সে লাইব্রেরিতে চলে আসে। সময়গুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। পিয়ালি আসে না। রামেশের মনে হয় এই বুঝি পিয়ালি এসে ঢুকলো। কিন্তু না, পিয়ালি আসে না। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে সে একেবারে নিরাশ হৃদয়ে বাসায় চলে আসে। আর বাসায় এসেই সে একটি চিঠি পায়। পিয়ালি লিখেছে।

তাকে নিষেধ করেছে অনুস্মরণ করতে। জানিয়েছে, ডিভোর্সের পর পিয়ালি খুব বেশি সুখে নেই। যার সাথে তাকে লাইব্রেরিতে দেখেছিলো সে তার স্বামী নয়। বন্ধু বলা যায়। প্রায়ই একসঙ্গে ঘুরতে বের হয়। তাদের বিয়ে হবার কোনও সম্ভাবনাও নেই।

পিয়ালির চিঠিটি পড়ে রামেশ কেমন যেনো একটু আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। তাহলে পিয়ালির বিয়ে হয়নি। মনের গোপন ঘরে কেমন যেনো একটু আশারও সঞ্চার হয়। এমন সময় গড়গড় করে তার টেলিফোনটি বেজে উঠে। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলে রামেশ। অপর কণ্ঠে দেবী শ্বেতা শুভসন্ধা জানায়। জানতে চায় রামেশ কেমন আছে? আজ এ ক' দিন পিয়ালিকে দেখার পর থেকে দেবী শ্বেতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো রামেশ। আজ আবার তার ফোন পেয়ে তড়াক কর তার কথা মনে পড়লো। শ্বেতা জানালো সে কলেজের চাকরিটি ছেড়ে দেবে। এখন থেকে বাবা মায়ের সাথে গ্রামেই থাকবে সে। রামেশ বুঝতে চেষ্টা করে যে, এখনকার দিনে চাকরি পাওয়া মানে সোনার হরিণ পাওয়া, সে যেনো চাকরিটা না ছাড়ে। অপর প্রান্ত থেকে দেবী শ্বেতা কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলে, "আপনি তো আমার সবকিছুই জানেন। এ রকম পরিস্থিতিতে একটি মানুষের বেঁচে থাকাটাই কি যথেষ্ঠ নয়? তাকে আর কি করতে বলেন? আমি কেবল বেঁচে থাকবো বেঁচে থাকার জন্য। শুধুই বেঁচে থাকার জন্য। এর বাইরে আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না।"

পরের সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে দেবী শ্বেতা কল জে আসে। অব্যহতি চেয়ে লেখা আবেদন পত্রটি রামেশকে দেখায়। রামেশ কিছু বলে না। নীরবে একবার চোখবুলিয়ে বলে, "ঠিক আছে।" দেবী শ্বেতা আবেদনপত্রটি নিয়ে প্রিন্সিপালের কার্যালয়ে যায়। আচমকা এমন আবেদনে প্রিন্সিপাল প্রথমে উত্তেজিত হয়, কিন্তু দেবী শ্বেতার অনড় অবস্থানে শেষ পর্যন্ত আবেদনপত্রটি রাখে। জানায় গভর্নিং বডির সাথে কথা বলে ফাইনাল জানাবে। কিন্তু দেবী শ্বেতা তখন থেকেই অব্যাহতি চায়। সে আর কলেজে থাকতে চায় না একমুহুর্তও। প্রিন্সিপালের কামরা থেকে বের হয়ে সে হন হন করে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। বিকেলে কি মনে করে রামেশ একবার দেবী শ্বেতার বাসার দিকে যায়। দেখে ভেতরে লোক আছে। কলিং বেল চাপে রামেশ। দেবী শ্বেতা দরজা খুলে দেয়। ভেতরে ঢুকে রামেশ চমকে উঠে। গ্রামে চলে যাবার প্রায় সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছে শ্বেতা। সবকিছু ব্যাগপ্যাক করা হয়ে গেছে। রামেশ জানতে চায়, "আজই কি চলে যাচ্ছেন?" দেবী শ্বেতা জবাব দেয়, "হ্যাঁ, আজ রাতের ট্রেনেই। রাত একটা বাজে ট্রেন ছাড়বে।" রামেশ বলে, "কোন ভাবেই কি সিদ্ধান্তটা পাল্টানো যেতো না?" শ্বেতা বলে, "লাভ কি হবে বলুন? ধরুন আমি চাকরিটা করছি। আর আমার বিয়েও হলো আবার, তা সে আপনার সাথেই হোক বা অন্য কারো। আপনি কি মনে করেন আমি আবার স্বাভাবিক নিয়মে সংসার করতে পারবো? আমার ঘাতক হাত কি আমার সামনে বিশাল পিরামিডের মতো ছায়া ফেলবে না অজস্রকাল?" রামেশের একবার ইচ্ছে হয় সে বলে, "আমি তোমার সব কালো ছায়া দূর করে দেবো। তোমার জীবনটাকে আবার ভরিয়ে দেবো আলোয় আলোয়। কিন্তু সে বলতে পারে না। সে ঠায় বসে থাকে মুর্তির মতো। নীরবতা ভেঙে দেবী শ্বেতা কথা বলে উঠে,

--আপনি কি ভাবছেন?"

--কি?

--আপনার বিয়ের ব্যাপারে? কাউকে কি মনস্থির করতে পেরেছেন?

রামেশের ইচ্ছে করে বলতে যে, “সে সুযোগ আর দিলে কোথায়? তুমি তো চলেই যাচ্ছো, তুমি থাকলে না হয় একটা কিছু ভাবা যেতো।” কিন্তু স□ কিছুই বলে না। তার বড়বেশি সাধ হয় শ্বেতাকে হাত ধরে থামায়। তার মনে হতে থাকে যেনো তার একটি মুখের আশ্বাসেই শ্বেতা থেকে যাবে। যেনো তার একটু সামান্য ভরসাতেই শ্বেতা ফিরে পাবে আবার সমস্ত সংসারযাপনের বিশ্বাস। কিন্তু সে কিছুই করে না। তার সমস্ত হাত পা যেনো সোফার সাথ□ বসে গেছে। সামান্য নড়াচড়াও সে করে না। শ্বেতা ডেকে উঠে--

--কী খাবেন, চা না কফি? সবকিছু গুছিয়ে ফেললেও চা-কফির সরঞ্জাম বাইরেই রেখেছি। একটু পরপর লাগে আমার।

রামেশ কিছুই খেতে চায় না। দেবী শ্বেতা জোর করে দুকাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসে। এককাপ রামেশের হাতে দিতে গিয়ে অজ□ন্তেই আঙুলে আঙুলের ছোঁয়া লাগে। দুজনেই রোমাঞ্চিত হয়। সামলে নিয়ে দেবী শ্বেতা বলে--

--আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না। আপনি কি কাউকে পছন্দ করেছেন?

রামেশ কি যেনো বলতে যাচ্ছিলো। তার ঠোঁট কয়েকবার নিয়ন্ত্রণহীন কেঁপে উঠে। তারপর সে কথাটি বলে তা হয়তো তার নিজের ভ□বনার মধ্যেও ছিলো না। বলে, “সেদিন সোনারগাঁ জাদুঘরে পিয়ালিকে দেখেছিলাম।” মুহূর্তেই কেমন যেনো একটা বরফশীতলতায় ছেয়ে যায় দেবী শ্বেতার বসার কক্ষটি। উভয়েই দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকে। সেটি কত যুগ, কতো জনম তা একমাত্র তারা দুজনেই অনুভব করতে পেরেছে। তারপর আস্তে আস্তে বরফ ছাওয়া শুকনো পাতার কণ্ঠে দেবী শ্বেতা বলে, “তাহলে আর আমাকে পিছু ডেকে লাভ কি?”

দহন পর্ব
কেনো শিখাইলারে প্রেম, ও বন্ধু কেনো দিলা জ্বালা
তোমার প্রেমেতে জ্বইলা পুইড়া অন্তর হইলো কয়লা

রামেশ আর দেবী শ্বেতা বারোটার মধ্যেই চলে এসেছে কমলাপুর। অনলাইনে টিকিট কাটা আছ□। পিকআপ থেকে মালপত্র কুলিরা বয়ে নিয়ে মালামালের বগিতে রাখলো। সারাক্ষণ রামেশ একেবারে নিজের লোকজনের মতো দেখাশোনা করলো সবকিছু। ট্রেন ছাড়তে আরও আধাঘন্টা বাকি। রামেশ ভাবলো দেবী শ্বেতাকে নিয়ে এককাপ কফি খাওয়া যাক। বলতেই দেবি শ্বেতা রাজি হলো। তারা ভ্রাম্যমান একটি কফিসেলার থেকে দুকাপ কফি কিনে পান করলো। কমলাপুর লোকে লোকারণ্য। তারা ভিরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। রাতের আলোয় তাদের মধ্যে একধরণের অন্তরঙ্গতা তৈরি করে দেয়। দেবী শ্বেতা বলে, “আমার জন্য এতোটা না আসলেও পারতেন। এখন আপনি একা একা আবার কতদূর ফিরবেন!” রামেশ কোনো কথা বলে না। তার খুব বলার ইচ্ছে হয় যে তোমার জন্য একমহাকাল পথ দূরে যেতেও আমার আপত্তি নেই। যদি তুমি হাত ধরো, তবে উদয়ের দিগন্ত থেকে অস্তের দিগন্ত অবধি হেটে যাবো অবলীলায়।” কিন্তু সে কিছুই বলে না। আরো কাছে ঘেষে আসে দেবী শ্বেতার। তারপর প্রায় অনুচ্চারিত স্বরে বলে, “আম□ কি তোমার হাত ধরতে পারি?” দেবী শ্বেতা যেনো শুনে না, কিন্তু শুনে ফেললো দেবী শ্বেতা। একটুকরো হাসি ছুড়ে বললো, “তার আর দরকার নেই।” ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা শোনা গেলো। দেবী শ্বেতা একবার তাকালো রামেশের চোখের

দিকে, পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলো। রামেশ যদি চোখের ভাষা বুঝতো, হয়তো সে জানতে পারতো যে শ্বেতা তাকে বলছে, "তুমি তো আমাকে হাত ধরে রেখে দিলেই পারো। তুমি আমাকে যেতে দিও না।" কিন্তু মনের ভাষা যথাযথ কে-ই বা পড়তে পারে? রামেশ চেয়ে চেয়ে দেখলো শ্বেতা ট্রেনে উঠে যাচ্ছে। ট্রেনের দরজা দিয়ে উঠার সময় শ্বেতা একবার ঘুরে হাত নাড়লো রামেশ□র উদ্দেশ্যে। রামেশও হাত নাড়লো। তারপর দেবী শ্বেতা টিকেট দেখে তার আসনটিতে গিয়ে বসলো। জানালার পাশেই। ইশারায় ডাকলো রামেশকে। রামেশ যেতেই বললো, "কোনোদিন যদি সময় পান, যাবেন সিলেট। আমি বেঁচে থাকবো। সত্যি বলছি, আমি মরবো না।"

ট্রেন ছেড়ে গেছে। রামেশ কিছুক্ষণ ঠাঁয় দ□□ড়িয়ে আছে সেখানে। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে মনে করতে পারে না। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার হাত পনেরো দূরে তারই মতো দাঁড়িয়ে আছে পিয়ালি। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারে না। এটি কিভাবে সম্ভব? এতোরাতে পিয়ালি এখানে কাকে এগিয়ে দিতে এসেছে। তার ইচ্ছে হয় পিয়ালিকে ডাক দিতে। আর অমনি পিয়ালিও তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দুজনের চোখাচোখি হয়। দুজনেই তাজ্জব হয়ে আছে। একচুলও কেউ নড়তে পারে না। যেনো দুজনের পায়েই মহাকালের শেকড় গজিয়ে গেছে। আর সে শেকড় গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত। দুজনে একটি বেঞ্চের উপর বসে। কেউ এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি। রামেশ মুখ খুলে?
--তুমি এখানে হঠাৎ?
--আমারওতো একই প্রশ্ন, তুমি এখানে কী করছো?
রামেশ কথা লুকায় না। সবকিছু সত্যসত্য বলে। সে দেবী শ্বেতাকে উঠিয়ে দিতে এসেছিলো স্টেশানে। পিয়ালি জানায় সে এসেছিলো রজনকে তুলে দিতে। রজন তার বন্ধু। রজনদের গ্রামের বাড়ি সিলেটে। ঢাকায় বাড়ি আছে। সে থাকে লন্ডনে। ছ' মাসের ছুটিতে দেশে এসেছিলো। ছুটি শেষ। এখন একবার গ্রামের বাড়িটি দেখে আবার সে লন্ডন চলে যাবে। কিছুটা আশার রেখা যেনো দেখে রামেশ। সে বলে--
--চিঠিতে লিখেছিলে, ডিভোর্সের পর থেকে তুমি ভালো নেই। কেনো?
--তা জানা কি তোমার খুব দরকার?
--জানলে হালকা লাগতো।
--কিন্তু আমার দুঃখটা আরও ভারি হতো। আমি আর সেসবের পুণরাবৃত্তি করতে চাই না।
রামেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,
--পিয়ালি, আমরা কি পারি না আবার আগের মতো সবকিছু ঠিকঠাক গুঁছিয়ে নিতে?
পিয়ালি কোনো কথা বলে না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে। বহুক্ষণ,বহুক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে থাকে। তারপর মেঘের ভেতর থেকে শব্দ টেনে টেনে এনে বলে--
--না রামেশ, সেই সাধ মিটে গেছে।
.